জীবনের আয়নায়

বহুরূপে সম্মুখে

আশিস নাজির

সাল সম্ভবত ১৯৮২-৮৩, চৈত্রের শেষাশেষি, রোদ-ঝলসানো দুপুর। আমি ওড়িশার বালেশ্বর থেকে জলেশ্বর হয়ে মেদিনীপুর জেলার এগরায় আসব। সঙ্গী বলতে একান্ত বিশ্বস্ত ড্রাইভার আলি আর জিপগাড়ি। আমার পেশার সঙ্গে ভ্রমণ শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিত্যদিন আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়।

তখন বালেশ্বর থেকে জলেশ্বর—জনপদটি প্রায় ফাঁকা থাকত। আজকের মতো এত ঘরবাড়ি, দোকানপাট কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রান্তিক বাজার আর হাতে গোনা কিছু চা-মুড়ি-তেলেভাজার দোকান। তবে পানের সহজলভ্যতা সর্বত্র। ওড়িশার মানুষ খুব পান পছন্দ করেন।

ওই নিদাঘ দুপুরে জনশূন্য রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি দ্রুতগতিতে গন্তব্য অভিমুখে চলেছে। হঠাৎ হলদিপদা বাজারের কাছে গাড়ির পেছনের একটা চাকা গেল পাংচার হয়ে। ‘‘কুছ পরোয়া নেহি’’—আলি বলল। সারাই করার সুযোগ নেই, তাই সম্বল স্টেপনি লাগিয়ে (অপর একটি টায়ার যা আপৎকালীন প্রয়োজনে গাড়িতে থাকে) গাড়ি ছুটে চলল। ঘড়িতে দুপুর দেড়টা। আমাদের সিদ্ধান্ত, জলেশ্বরে ভাল হোটেল আছে, দুপুরের খাওয়া ওখানেই হবে। কিন্তু আবার বিপত্তি। জলেশ্বর ঢোকার কিছু আগে সুবর্ণরেখা নদীর উপর রাজঘাট ব্রিজে আমাদের গাড়ির আর একটি টায়ার পাংচার হয়ে গেল। এখন আর কোনও উপায় নেই। টায়ার না সারাই করলে গাড়ি এক পাও এগোবে না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কী করব! জনশূন্য চারিদিক, একটাও দোকান চোখে পড়ছে না। বহুদূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। চৈত্রের খরতাপে আমরা নাজেহাল। অসম্ভব খিদে পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। আমাদের কাছে পানীয় জল পর্যন্ত নেই।

কষ্টে যন্ত্রণায় রোদে পুড়তে পুড়তে ভগবানের উপর বড় অভিমান হল। ঠাকুর, এ কী পরীক্ষায় ফেললে! অভিধানের ‘ভবিতব্য’ শব্দটার মানে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। প্রখর রোদে সেতুর রেলিং ধরে ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখার দিকে চেয়ে আছি। এমন সময় জলেশ্বরগামী একটি লরির দেখা পাওয়া গেল। পাংচার হওয়া টায়ারটা নিয়ে দ্রুত বাঁ পাশে গিয়ে হাত দেখাল আলি। লরি দাঁড়িয়ে ওকে তুলে নিল। লরিতে উঠে আলি বলল, ‘‘স্যার, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি টায়ার সারিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।’’

নির্জন প্রান্তরে চৈত্রের দুপুরে আমি এক বিপন্ন

পথিক। জঠরজ্বালায় কাতর। আমার অনুভূতির মধ্যে মিশে যাচ্ছে—ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাব যাদের নিত্যসঙ্গী সেইসব মানুষের চেনা মুখগুলো। রাস্তায় পাড়ায় যাদের প্রতিদিন দেখি। সত্যি, কোনওদিন ভাবিনি, সারাজীবন মানুষ এগুলিকে সাথি করে কীভাবে হাসিমুখে বেঁচে থাকে। হায় ভগবান! তুমি বোধহয় একদিনের এই বিড়ম্বনা দিয়ে আমার চেতনাকে জাগরূক করছ!

মুহূর্তে সমস্ত কষ্ট যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ভাবছি, হে সুবর্ণরেখা, কোথায় গেল তোমার আষাঢ়ের ভয়াল ভয়ংকর রূপ? কূলছাপানো সে-অট্টহাসি কোথায়—যৌবনের উচ্ছ্বাস—উত্তাল জলরাশির তাণ্ডব নৃত্য? এখন যেন সব নির্মোক খুলে এক শীর্ণকায়া অধীর প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে রোদ্রতপ্ত আকাশের দিকে। কবে তুমি আসবে আষাঢ়? বৃষ্টিরূপী রামচন্দ্রের অপেক্ষায় আঁচলে স্বপ্ন বেঁধে বেঁচে রয়েছে শবরী সুবর্ণরেখা।

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি—এক প্রৌঢ় আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। পরনে লাল গামছা, মাথায় ঝাঁকা, ঘর্মাক্ত কলেবর। ওড়িয়াতে জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়। ওড়িয়াতেই উত্তর দিলাম। বললেন, ''বাবা তুমি কাঁঠাল খাবে? আহা কাদের বাড়ির ছেলে গো তুমি? মুখটা রোদে একদম শুকিয়ে গেছে।'' ইঙ্গিতে দেখালেন—''সুবর্ণরেখার ওই দিকটাতে আমার বাগান। আমার বাগানের কাঁঠাল তুমি খাবে বাবা?'' ইচ্ছে-লোভ-খিদে সবই প্রবল। আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক মাথা থেকে ঝাঁকা নামিয়ে রাস্তার পাশে রাখলেন। পাকা কাঁঠাল বেশ কিছুটা ভেঙে আমার সামনে ধরলেন : ''তুমি এটা খাও বাবা। আমার কাছে থালা-বাটি নেই যে তোমায় সাজিয়ে গুছিয়ে দেব। দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখছি তুমি রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছ। ভরদুপুরে নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয়নি। তাই সোজা রাস্তায় বাড়ি না গিয়ে ব্রিজ দিয়ে এলাম। মনটা বড় খারাপ লাগছিল। আমার ছেলেটাও তোমার বয়সি বাবা! আমার দুটো নাতি, কাঁঠাল খেতে খুব ভালবাসে। তারাই আমার প্রাণ। ওদের জন্যই ঝাঁকায় করে পাকা কাঁঠাল নিয়ে যাচ্ছি।''

এই নির্বান্ধব নির্জন দুপুরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভেবে পাকা কাঁঠালের বেশ কিছুটা গ্রহণ করলাম। দেখলাম মানুষটির মুখে তৃপ্তির একঝলক হাসি। ''আসি বাবা''—বলে ব্রিজ থেকে নেমে ঝাঁকা মাথায় সুবর্ণরেখার চর ধরে মেঠো পথে দূরে সবুজ গ্রামের দিকে এগোতে থাকলেন।

আমি কাঁঠাল খেতে খেতে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে আমার ঈশ্বর দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছেন। মনে মনে প্রণাম জানালাম। আমার চোখের কোণে জল। ঘামে ভেজা খালি গা, খালি পা, মাথায় ঝাঁকা—মানুষটির চলে যাওয়ার পথে আমি স্বামীজীর ভারতবর্ষকে দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ একটা লরি এসে দাঁড়াল। আলি টায়ার সারিয়ে এনেছে। জিপ চালাতে বসে আলি বলল, ''দিন বেকার হো গিয়া সাহাব। আজ আপকা খানা কুছভি নেহি মিলা।''

''মিলা আলি, মিলা। বহুত আচ্ছা মিলা। ভগ্ওয়ান খুদ আয়েথে মেরা পাশ।''

''ভগ্ওয়ান?''

''হাঁ আলি। হামারা ভগ্ওয়ান, তুমহারা আল্লা।''

বহু বছর আগের কথা। এখন ব্যস্ততার জীবন। সে-নির্জনতা আর নেই। সেই রাজঘাট ব্রিজ পেরিয়ে ওড়িশা যেতে হয় প্রায়ই। দামি গাড়ি হুস হুস করে ব্রিজ পেরিয়ে যায়। তবু রাজঘাট আমি ভুলতে পারি না। ব্রিজ পেরোতে পেরোতে সুবর্ণরেখার সেই তীরের দিকে চেয়ে থাকি। আমার অন্তর্লোকে প্রতিভাত হয়—মাথায় ঝাঁকা, খালি গা, খালি পা, আমার ভগবান আজও হেঁটে চলেছেন। আমি দুহাত জোড় করে প্রণাম করি সেই শাশ্বত অন্তর্যামীকে।